ডিসকভারী ল্যাবের কেস হিষ্ট্রী : রাঘবন মৃত্যুরহস্য

সব্যসাচী সরকার

২৪ ডিসেম্বরের আড্ডার জের সন্ধ্যা পেরিয়ে মাঝ রাতে শেষ হলো। রহস্য গল্প ও গোয়েন্দা নায়কদের পরিচিতি নিয়ে আলোচনা হচ্ছিলো । গোগোল ও ফেলুদার সঙ্গে ব্যমকেশ বক্সী অমনিবাস রচনা সম্ভার আজকাল সিনেমা-টিভির সিরিয়ালে চিত্রনাট্যকারদের মেক ও রিমেক এক্সপেরিমেন্টের যোগান দিয়ে আসছে । তবে নতুন রহস্য গোয়েন্দা কাহিনী অতি পরিচিত স্রষ্টাদের মৃত্যুতে শেষ হয়ে যাচ্ছে আর সেটা বোঝার আগেই কাকাবাবুর মৃত্যু বাংলা ভাষার গোয়েন্দা চরিত্রগুলি যে অবলুপ্তির পথে সে নিয়েই তর্ক হচ্ছিলো। নতুন যুগের নতুন কোনো গোয়েন্দা নায়কের সেরকম সাড়া জাগানো আবির্ভাব এর গল্প আমাদের চোখে পড়েনি। রহস্য অনুসন্ধানের চরিত্রগুলির কাজের পদ্ধতি সাধারন জ্ঞান ও প্রচলিত বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর নির্ভরশীল । প্রায় সব গোয়েন্দা প্রমান সংগ্রহের জন্য অপরাধ সংগঠিত হবার জায়গায় সত্বর সরজমিনে তদন্ত করে থাকেন। ।গোয়েন্দা কাহিনীর লেখকেরা গোয়েন্দাদের পর্যবেক্ষন শক্তি খুবই সুক্ষ হওয়ার বর্ননা দেন। তারা অপরাধ জনিত জরুরী তথ্য গুলি জেনে আর তথ্য গুলির ভালো বিশ্লেষনের জন্যে ক্রাইম ঘটনায় সম্ভাব্য জড়িত ব্যক্তিবিশেষদের প্রশ্ন করে আসল ঘটনার সঠিক ব্যাক্ষা দেবার চেষ্টা করে থাকেন। তর্কের খাতিরে ফেলুদা ও সিধু জেঠুর মধ্যে পর্যবেক্ষন শক্তির ক্ষমতা কার বেশী হতে পারে সে দ্বন্দে সবাই প্রায় একমত হয়েছিলাম যে সব তথ্য গুলি সিধু জেঠুকে দেওয়া হলে তিনি চেয়ারে বসেই একজন সফলতম ক্রাইম ইনভেষ্টিগেটর হতে পারতেন। মাঝ রাত্রিতে আড্ডা ভঙ্গের জন্য পরেরদিন সকালে উঠতে দেরী হওয়াতে হাওড়া স্টেশনে পৌছতে আমার দেরী হয়ে গেলো । যাই হোক ট্যাক্সী থেকে নেমে প্রায় দৌড়ে ৭ নম্বর প্লাটফর্মে অপেক্ষারত রাঁচি গামী শতাব্দী এক্সপ্রেসের এক্সিকিওটিভ কৌচে উঠে পড়তেই ট্রেন চলতে শুরু করলো। ট্রেনে আমার সংরক্ষিত আসনটি খালিই ছিলো। হাতের ল্যাপটপের ব্যাগটা মাথার উপরের ব্যাগেজ ক্যারিয়ারে রেখে রাত্রির আলোচনায় সিধু জেঠুর অনুসন্ধিত্সু প্রতিভার কথা ভাব ছিলাম । এমন সময় মোবাইলে মানসের এস্ এম্ এস্, ভেসে এলো, " আনন্দ বাজারের তৃতীয় পাতার দুই নম্বর কলমের খবরটা দেখেছেন ? আমার উপর চাপ পড়ছে , সাহায্য দরকার " । ট্রেনের এই কৌচে বিনা পয়সায় খবরের কাগজ পাওয়া যায় তাই কোচ অ্যাটেন্ডেন্ট কে অনুরোধ করতেই এককপি পত্রিকা হাতে পেলাম। তৃতীয় পাতাটি বের করতেই জাতীয় গবেষনাগারের তরুন বৈজ্ঞানিকের রহস্যময় মৃত্যুর সংবাদটি দেখতে পেলাম। মাত্র ৩৭ বয়সের ডঃ রাঘবনের হঠাৎ অসুস্থ হওয়ার খবরটা কালই জানতে পেরেছিলাম যখন তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিলো। সংবাদের পাতায় অসুস্থতার কারণ না বুঝতে পারার জন্য সময়মত উপাচার না হওয়ায় মৃত্যু হয়েছে মন্তব্য করা হয়েছে । বিষয়টি গুরুত্বপুর্ন কারণ রাঘবন ডিফেন্স সম্ভন্ধীয় মাইক্রো-অপটিক্স ও ইলেকট্রোনিক্সে গবেষনা করছিল তাই তার অকাল মৃত্যুর কারনটা জানা অত্যন্ত জরুরী। মানসকে ফোন করে হাসপাতালের মুখপাত্রের বক্তব্য জানতে পারলাম । এক অজানা রোগের জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে সে বিষয়ে ডাক্তারদের এক প্যানেল তার রক্ত ও ইউরিন স্যাম্পেল প্যাথলজিকাল ল্যাবরেটরীতে পাঠিয়ে কিছু বোঝবার আগেই রাঘবনের মৃত্যু হয় । প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরীর রিপোর্টে ইনফেক্সাস মাক্রোবের অনুপস্থিতি এবং দৃশ্যত মৃত্যুর সহজ কোনো কারন না পাওয়ায় মৃত্যুটি রহস্যে ঘেরা। শুধু ক্রিয়েটিন কিনেজের অ্যাক্টিভিটি অনেক বেড়ে যাওয়ায় মাসল্ ড্যামেজের ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিলো ।এ বিষয়ে রাস্তায় আর কথা না বাড়িয়ে মানসকে আমাকে ই-মেলে সব জানাতে বললাম। মাত্র তিন ঘন্টার যাত্রাশেষে আমি আমার বাড়ি পৌছে যাবো আর সেখানে আমার বহুল ব্যবহৃত ডিসকভারী ল্যাবরেটরীটি আছে । মানসের সাহায্যের জন্য সামান্য টুকিটাকি অ্যানালিসিস ও কেসটা ভাবার সময় সহজেই পাওয়া যাবে সেখানে।

মানস এখন কোলকাতাস্থিত ফরেনসিক ল্যাবরেটরীর ডাইরেক্টার । প্রথম জীবনে তার গবেষনার হাতেখড়ি আমার হাতে। আই আই টি কানপুরে এম্ এস্ সী করা কালীন আমার অধীনে রাসায়নিক টক্সিকোলজিতে মাস্টার রিসার্চ করে আমেরিকাতে কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐ বিষয়েই ডক্টরেট উপাধি নিয়ে দেশে ফিরে কয়েক বছরের মধ্যেই ভারতের ফরিদাবাদস্থিত ফরেনসিক ল্যাবরেটরীতে ভালো কাজ করার পরে কলকাতার ফরেনসিক ল্যাবরেটরীর ডাইরেক্টার হয়েছে। বিশেষ প্রয়োজনে ও আমার সাহায্যের আশা করে থাকে। বুঝলাম এবারে ডিফেন্স মিনিস্ট্রীর চাপ আছে মানসের উপর এই মৃত্যুর সঠিক ও শীঘ্র কারন নির্ধারনের জন্য ।

ডিসেম্বরের শেষের দিনগুলি আমি ভারতে থাকলে আমার কৈশোর কালের বিজ্ঞানের হবি হাওস যা এখন আমার বসত বাড়ী সংলগ্ন ডিসকভারী ল্যাবরেটরী নামে পরিচিত সেখানে কিছুদিন বিশ্রাম নিয়ে থাকি। ল্যাবরেটরীতে বিশ্রাম কথাটা একটু বেমানান তবে ঐ হবি হাওস তকমাটা মানসিক স্বাচ্ছ্যন্দের জামাটা পরিয়ে রাখে। বাড়ী ও ল্যাব সংযুক্ত বাগান এক শান্ত পরিবেশ তৈরী করে থাকে। তাই অজয় নদের তীরে ঝারখণ্ডের এই পুরোনো স্বাস্থকর শহরে আমার এই ল্যাব-কাম-বাড়ীটি কিছুদিন অজ্ঞাত বাস করার উপযুক্ত। বিগত মাস গুলির শেষে পুরো বছরের আমার পছন্দের বৈজ্ঞানিক ঘটনাগুলি বর্ষ শেষে আমি বিস্তরিত ভাবে লিখে রাখি। এই অজ্ঞাত বাসে পৃথিবীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ই-মেল ও মোবাইল ফোন মারফৎ হয়ে থাকে। আসানসোল ষ্টেশনে নেমে ৪০ কিলোমিটার রাস্তায় যেতে হবে আমাকে আমার গন্তব্য স্থানে পৌছতে। সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ ষ্টেশন থেকে বের হয়ে বাড়ীর জন্য রওনা দিলাম । বাড়ীর পুরোনো ড্রাইভার রবিন ঘন্টা খানেকের মধ্যেই গাড়িতে আমাকে সেই বিশ্রামের শান্ত পরিবেষে পৌছে দেবে। নিশ্চিন্ত হয়ে এবারে রাঘবনের মৃত্যু রহস্যের সম্ভাব্য কারনগুলি কি হতে পারে তা নিয়ে ভাবতে বসলাম।

বাড়ীতে পৌছে স্নান ও খাওয়া সেরে ল্যাবরেটরী সংলগ্ন অফিস ঘরের কম্পউটারে মানসের পাঠানো বিস্তারিত মেলটি পড়লাম। ঘটনাটি সংক্ষেপে বলতে গেলে এই দাঁড়ায় যে ২৩ এ ডিসেম্বর রাঘবন এক ঘরোয়া অনুষ্টানে তিন সহকর্মীর সঙ্গে সান্ধ্য ভোজনে যোগ দেয়। রাত্রিতে বাড়ী ফিরে শোবার পরেই অস্বস্থি বোধ করে, শেষে ভোর রাত্রে বমি ও পেটে ব্যথা আর পায়ের স্নায়ুতে ভীষন যন্ত্রনায় কাতর হয়ে তার সহকর্মী ডঃ অনুময় মুখার্জী কে টেলিফোন করে। ২৪ এর সকালে তাকে কাছের এক হাসপাতালে ভর্তি করা হয় পরে নিশ্বাসের কষ্টের কারনে অবস্থার অবনতি হলে ল্যাবরেটরীর উর্ধতন বৈজ্ঞানিকদের খবর দেওয়াতে তারা ২৪ এর সন্ধায় একটি বড় বেসরকারী হাসপাতালে রাঘবনকে স্থানান্তরিত করে। যন্ত্রনা কমানোর ওষুধ আর প্যাথলজিক্যাল মাক্রোব আটকাতে টাজোব্যাকটাম-পিপারাসীলিনের ইন্জেকসন দেবার আগে প্যাথলজিক্যাল টেষ্টের জন্য স্যাম্পেল নেওয়া হয় কিন্তু রিপোর্টের অপেক্ষা করার সময় আর পাওয়া যায়না। মাঝ রাতে তার মৃত্যু হয়। ২৫ এর সকালে প্যাথলজিক্যাল টেষ্টে হঠাৎ এই মৃত্যুর কারন হিসেবে মাসল্ ড্যামেজের সঙ্গে রক্ত ক্ষরনের কথা রিপোর্টে লেখা হয়।একটা সবল সুস্থ মানুষের হটাৎ মাসল্ ড্যামেজ এর সঙ্গে করোনারী য়্যাটাকে হার্ট ফেলিওর হলই বা কেন তাই মৃত্যুর কারন নির্ধায়নে ফরেনসিক ল্যাবরেটরীর সাহায্য চাওয়া হয়েছে।

মানসকে উত্তরে লিখলাম যে তার মেল পেয়েছি আর রাঘবনের ২৩ তারিখের রুটিন ও তার খাবার তালিকা জোগাড় করে আমায় পাঠাতে। শেষে রাত্রিতে আমায় একটু ভাবতে দাও লিখলাম।

সন্ধ্যায় হালকা করে ডিনার সারলাম ও পরে আমার পুরোনো কেসের ফাইল গুলির উপর চোখ বোলাতে আরম্ভ করলাম। বোঝা যাচ্ছে যে এই মৃত্যু বিষক্রিয়ার জন্য হয়েছে। তবে সেটা য়্যাক্সিডেন্টাল না সুইসাইড না হোমিসাইড তা বুজতে গেলে বিষটা কি প্রকারের সেটা জানতে হবে। সেটা জানতে পারলে বিষটা কিসের মাধ্যমে ও কখন শরীরে প্রবেশ করেছিলো তার সম্ভাবনা গুলো সামনে আসা দরকার। এর পর এই মৃত্যুর আসল মোটিভের বিষয়টা বার করতে পারলে মৃত্যুরহস্যের সমাধান সম্ভব। সাধারনত বিষক্রিয়া বিভিন্ন কারনে হতে পারে তবে সেটাকে দু ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমটা বিষটা কোন প্যাথোজেন যা জীবাণু হতে পারে । সেটা খাবার বা জল বা খুব খারাপ আবহাওয়ার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে সংক্রামিত হতে পারে । খারাপ মাধ্যম বলতে অপরিষ্কিত কুকুর-বেড়াল জাতীয় বাড়ীর আশ্রিত প্রানীরাও এগুলো বহন করতে পারে। অন্য ভাবে বিষটা কোন রসায়নিক পদার্থ হতে পারে আর সেটাকে জৈব ও অজৈব হিসেবে ভাগ করা যেতে পারে। সহজে জোগাড় করা যেতে পারে এরকম জৈব রসায়নিক পদার্থ গুলির লিষ্টটি অনেক লম্বা হতে পারে তবে বেশী মাত্রায় সেসব বিষ সাধারনতো খাওয়ানো শক্ত কারন এদের বেশীর ভাগই অত্যন্ত তেঁতো বা কষা তাও আবার পর্যাপ্ত পরিমান যাকে ফ্যাটাল ডোজ বলা হয়ে থাকে সে মাত্রায় খাবারে মেশানো শক্ত কারন শুধু বিজ্ঞানী নয় যে কোনো সাধারন জ্ঞান রাখে এমন মানুষ খাবারে ঐ মাত্রায় মেশানো সেরকম বিষের খবর না জানতে পারলেও মুখে খাবারের স্বাদের তফাৎ সহজেই ধরতে পারবে। কম মাত্রায় অল্প করে করে এধরনের বিষ প্রয়োগে ভিক্টিম বুঝতে পারেনা যে তাকে বিষ খাওয়ানো হচ্ছে । সেটাকে স্লো পয়জন বলা হয়। রাঘবনের মৃত্যু যে সল্প সময়ের তীব্র বিষক্রিয়া তাই এ ধরনের বিষের কাজ নয় তা বুজতে পারলাম। এটাও বুঝতে পেরেছি যে রাঘবনের স্বাস্থ ভালো ছিল, কোনো নেশার

বদভ্যাস ছিলোনা ও তামিল ব্রাহ্মণ হওয়ার জন্য নিরিমিষ আহারে অভ্যস্ত ছিলো। এর বেশী কোনো তথ্য আমার হাতে নেই যাতে জোর দিতে পারি। তাই মানসের পরের মেলের অপেক্ষা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরের দিন সকালে চা পান করে ল্যাবরেটরী সংলগ্ন বাগানে পায়চারী করতে করতে তথ্য ভিত্তিক কি কি করনীয় তা ভাবছিলাম। রাঘবনের ভর্তির সময়কার মেডিক্যাল রিপোর্ট ও ২৩ তারিখের খাদ্য তালিকার লিষ্ট পাওয়া খুবই দরকার পরে করোনারের রিপোর্টও অস্বাভাবিক এই মৃত্যুর কারন বার করতে সাহায্য করবে তা মানসকে লিখে পাঠালাম । আজকে মানসের যে প্রথম মেলটি পেলাম তাতে কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া গেলো যেমন গত জুলাই মাসে লাইফ ইনসিয়রেন্সের জন্য যে মেডিক্যাল টেষ্ট রাঘবন করিয়েছিল তাতে সে ৫ মাস আগে ভালো রকম সুস্থ ছিলো তার প্রমান । রাঘবনের স্ত্রী পুত্রসহ চেন্নাই যান বড়দিনের ছুটিতে গত ২২এ ডিসেম্বর যবে তার ছেলের স্কুলের শীতের অবকাশ শুরু হয়েছিলো ও রাঘবন ছুটি নিয়েছিল মাত্র দুই দিনের,৩১ এ ডিসেম্বর ও পয়লা জানুয়ারী,ওদের চেন্নাই থেকে নিয়ে আসার জন্যে। ২২ এর রাত্রিতে ও ২৩ তারিখের সকালে বাড়িতেই ভাত ফুটয়ে ফ্রীজে স্ত্রীর রাখা কিছু রান্না করা সব্জী ও বাড়ীর পাতা দই দিয়ে সে ডিনার ও পরের দিনের লান্চ সারে, এ তথ্য সে সেদিন সন্ধায় তার তিন সহকর্মীর সঙ্গে খাবারের সময় জানিয়েছিলো।সেইদিন অনুময়ের বাড়ীতে সন্ধ্যার ঘরোয়া অনুষ্টানে তিন সহকর্মী সিনিয়রিটী ধরে যথাক্রমে গ্রুপ লীডার,ডঃ অনুময় মুখার্জী, ডঃ বিজয় পাটানকর ও শেষে ডঃ রমেশ খুরানা যে রাঘবনের সঙ্গে একই দিনে কাজে জয়েন করে তবে বয়েসে বড়ো বলে সেও রাঘবনের সিনিয়ার হিসেবে ধরা যেতে পারে।অনুষ্টানে সব খাবারই অনুময়ের স্ত্রী বাড়ীতে রেঁধেছিলেন শুধু কিছু নন্ ভেজ খাবার হোম ডেলিভারীতে কাছের রেষ্টোরেন্ট থেকে আনা হয়, রাঘবন ভেজেটারিয়েন তাই সে রেষ্টোরেন্টের খাবার খায়নি।

দুপুরে মানসের বিস্তারিত ই-মেলে রাঘবনের খাবারের মেনু ও হাসপাতালের ভর্তির মেডিক্যাল টেষ্ট এর রিপোর্ট পেলাম। ইসিজি রিপোর্টে পরিষ্কার করে দ্রুত ও অসঙ্গত হার্ট রেট লেখা তার সঙ্গে পেটে ও নিম্ন অঙ্গে যন্ত্রনা আর দৃষ্টির অসচ্ছতার জন্যে তাকে অ্যাডেনোসিন দেওয়া হয় যাতে রক্ত বাহক আটারী গুলো ডায়ালেট হয়ে রক্ত সন্চালনে সাহায্য করে ।রোগীকে দাঁড় করিয়ে প্রেসারের অসঙ্গতি মাপার মত অবস্থা ছিল না তবে রক্তে অক্সিজেনের অভাব আঙ্গুলের নখের কোন গুলিতে কালচে নীলাভ আভা স্যায়ানোসিসের লক্ষণ দেখা দেওয়াতে অক্সিজেন দেওয়া হতে থাকে।

এটা এক ঘাতক টক্সিনএর প্রভাব তা সবাই বুঝতে পারে। তবে সেটার উৎস বায়োলজিক্যাল বা কেমিক্যাল সেটা না জানতে পারলে নিরাময়ের দিকটা সঠিক করার জন্যে প্যাথোলজিক্যাল টেষ্টের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিলো না এদিকে রোগী আস্তে আস্তে কোমার মধ্য দিয়ে কোরোনারী অ্যাটাকে মারা যাওয়ায় মেডিক্যাল প্যানেলের ডাক্তাররা অসহায় বোধ করেছেন ।প্যাথোলজিক্যাল টেষ্টে কোনো বিশেষ মাইক্রোভের সনাক্তকরন না হওয়ার জন্য এটা যে একটা রাসায়নিক বিষক্রিয়ার ঘটনা তা বোঝা যায়। তবে এই রাসায়নিক বিষটি কি প্রকারে রাঘবনের শরীরে প্রবেশ করলো সেটা জানা দরকার। ডিফেন্স মিনিষ্ট্রী জানতে চায় যে এটা কি একটা দুর্ঘটনা না আত্মহত্যা বা হত্যা। এখানেই করোনার রিপোর্টের সঙ্গে ফরেনসিক ল্যাবোরেটরীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে বিষটি বার করতে ও সম্ভব হলে সীবীআই বিষটি কে ও কিভাবে ব্যবহার করেছে সে বিষয়ে তদন্ত করবে।

অনুময়ের বাড়ীতে যখন রাঘবন আসে তখনো পর্য্যন্ত সবাই তাকে হাসি খুসী দেখেছে তাই আত্মহত্যার ব্যাপারটা তেমন জোর পাচ্ছে না। কোনো সুইসাইড নোটও তদন্তের পুলিস রাঘবনের ফ্ল্যাট থেকে পায়নি। গ্রুপ লীডার ডঃ অনুময় মুখার্জীর মতে রাঘবন এক বিশেষ ধরনের কাঁচ নিয়ে গবেষনা করছিল যাতে ইনফ্রারেড আলোর প্রভাবে কাঁচের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহ করানো সম্ভব আর আমাদের স্পেস রিসার্চে এটার ব্যবহার সুদুরপ্রসারী। গবেষনাটি একেবারে শেষ পর্যায়ে পৌচেছিল ও অবধারিত সাফল্যের জন্য রাঘবনের নাম ২৬ এ জানুয়ারীর জাতীয় পুরষ্কারের তালিকায় মনোনীত হয়েছিলো। ডঃ মুখার্জী এই খবরটি সবার কাছে চেপে রাখলেও রাঘবনকে তা জানিয়েছিলেন এবং এ বিষয়ে ২৬ এ জানুয়ারীর আগে কারো সঙ্গে আলোচনা করতে নিষেধ করেছিলেন।এই খবরে রাঘবন খুবই খুসী হয়েছিল তাই কাজের দিক দিয়ে সে সম্পুর্ন ভাবে হ্যাপী ছিল। তার ফ্যামিলী লাইফও ১০বছরের ছেলে ও স্ত্রীর সঙ্গে সম্পুর্ন ছিল। কাজেই সুইসাইড থিয়োরীটা আপাতত প্রায়োরিটি লিষ্টের তলায় রইলো। যদি এটা দুর্ঘটনা ধরা হয় তবে কি ভাবে সেই বিষ এক

বৈজ্ঞানিকের অজান্তে অল্প কালের মধ্যে শরীরে বেশ ভালো মাত্রায় প্রবেশ করলো ? রোগীর বিষক্রিয়া ক্রনিক বিষের স্লো ব্যবহার নয় এটা ফ্যাটাল ডোজের লক্ষ্যণ বলে বুঝতে অসুবিধা হয়না। তাহলে এটি যে একটি সুপরিকল্পিত হত্যা ও হত্যার রঙ্গমঞ্চ ডঃ অনুময় মুখার্জীর বাড়ী তা সহজেই বোঝা যাচ্ছে।

রাঘবনের খাবার এর তালিকায় শুধু ফ্রায়েড রাইস ও রায়তা যা মিসেস মুখার্জী বাড়ীতে রেঁধে ছিলেন এবং এগুলো সবাই কমন পাত্র থেকে শেয়ার করে খেয়েছিলো বাকী দোকানের নন্-ভেজ খাবার যেগুলি সে ছাড়া বাকী সবাই খেয়েছিলো। কাজেই বিষ প্রয়োগ এ খাবার গুলির মাধ্যমে করা বিশেষ ভাবে কঠিন যদি না গৃহ কর্ত্রী নিজেই এ কাজে জড়িত থাকেন। কিন্তু তাঁর কোনো মোটিভ পাওয়া যাচ্ছে না যেখানে ডঃ মুখার্জী রাঘবনকে ভালো কাজ করার জন্য বিশেষভাবে স্নেহ করতেন।

অনেক ভেবে শেষে মানসকে ফোন করলাম যে বিষটাকে ধরতে গেলে মৃতের ইউরিন পেলে কাজটা সহজ হতো তবে এখন কিডনী বা হার্টের কিছু টিসু কাজে লাগাতে হবে । সম্পূর্ণ ভাবে এগুলোর অক্সিডেসন করে অ্যাটোমিক অ্যাবষর্পসন স্পেকট্রোস্কপির সাহায্যে আমার ডায়াগোনিসের সেই মারণ যৌগটিকে ধরতে হবে। কারণ এই বিষ যে কোনো জৈব রসায়নিক নয় তা বোঝা সহজ। তার কারণ রাঘবন ২৩এর সন্ধ্যায় সম্পূণ ভাবে সুস্থ ছিল আর পরে সে সবার সঙ্গে একই আহার করেছে আর ডিনারের পরে মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে তার মারাত্বক ভাবে অসুস্থ হয়ে ওঠা যদি রাঘবনের অজ্ঞাতে বিষ প্রয়োগে হয় তাহলে সেই বিষের অজৈব হবার সম্বাভনা প্রবল। এর মধ্যে বিশেষ কিছু অজৈব বিষ গন্ধ-বর্ণ হীন ও কখনো সামান্য নোনতা বা মিষ্টি তাই সহজে খাবারের সঙ্গে মিশে যাওয়ার গুণ রেখে থাকে। প্রথমেই আধুনিক কোন বায়ো টষ্কিন খোঁজাটা হয়তো ভুল হয়েছে তা ছাড়া নিত্য ব্যবহৃিত প্যাথোলজিক্যাল ল্যাবোরেটরী মেটালিক এলিমেন্ট অ্যানালিসিস করার জন্য প্রস্তুত থাকেনা ।ওকে আরো জানালাম যে সীবীআই তদন্ত লাগবে না যদি তার ডিপার্টমেন্ট রাঘবনের ল্যাবরেটরীর লগ বুকের সঙ্গে অ্যালমারীর কেমিক্যালের লিষ্ট মিলিয়ে নিতে পারে। আর রাঘবনের ল্যাবরেটরী নোট বুক, ব্যবহৃিত কম্পিউটার, তার ব্যক্তিগত ল্যাপটপ্, ও কোন ডায়েরী থাকলে সেগুলি ইনভেষ্টিগেশনের জন্য যেনো স্বত্তর কাষ্টডিতে নিয়ে নেওয়া হয়। এগুলোর মধ্যস্থিত ডকুমেন্টগুলি পড়ে কোনো বিসঙ্গতি আছে কিনা তা বার করতে হবে।

মানসকে এও জানালাম যে বিষ সম্বন্ধে আমার একটা ধারণা হয়েছে তা প্রমান করতে ওই কিডনী বা হার্ট টিসুর অক্সিডেসনের পরের যে দ্রবনটি তৈরী হবে তা একটা আধ সেন্টিমিটার লম্বা ও আধ সেন্টিমিটার চওড়া ফিল্টার পেপারে একটু ভিজিয়ে হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে ড্রাই করে একটা সেলোফেন কভারে রেখে একটা খামের মধ্যে প্যাক করে যদি আমায় ক্যুরিয়ার সার্ভিসে পাঠানো হয় তবে কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমার বাড়িস্থিত ডিসকভারী ল্যাবরেটরী সেই বিষটার হদিস দিয়ে দেবে। বিসঙ্গতি একটা থাকবেই ও সেটাই ক্রাইমকে ধরতে সাহায্য করবে।

এর তিনদিন পরে ক্যুরিয়ারে পাঠানো খামটি পেলাম। ব্লটিং পেপারটি চিমটেয় ধরে বার্নারের নীল রং এর ফ্লেমের উপর ধরতেই টেষ্টটি যে পজেটিভ তার জন্য পেপারটি সবুজ রং ছড়িয়ে পুড়ে থ্যালিয়াম এর উপস্থিতি জানিয়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে মানসের উত্তেজিত ফোন পেলাম, 'স্যার ক্যুরিয়ার পেয়েছেন তো ?' উত্তরে হ্যা বলতে মানস বলে চললো, 'রাঘবনের তার স্ত্রীকে লেখা ২৩ তারিখের ই-মেল টা পড়ুন আপনাকে ফরোয়ার্ড করেছি '। ই-মেল টা খুলতেই সব পরিষ্কার হয়ে গেলো । রাঘবন বিষ্ময় প্রকাশ করে তার স্ত্রীকে জানিয়েছে যে ডঃ বিজয় পাটানকর তার থ্যালিয়াম সালফাইড যুক্ত কাঁচ নিয়ে গবেষনার কথা জেনেও তার কাছ থেকে এক গ্রামের এক থ্যালিয়াম সালফেটের ভায়েল আজ ধারে নিয়ে গেলো পরে তার অর্ডারের ডেলিভারী হলে ফেরত দিয়ে দেবে বলে । রাঘবন এও লিখেছে যে ডঃ পাটানকর থ্যালিয়াম নিয়ে কোনো কাজ এখোনো করেন নি তবে পৃথিবীর প্রত্যেক ল্যাবোরেটরীতে একটা অলিখিত কোড অফ কনডাক্ট থাকে ও এর মধ্যে এটাও মেনে চলা হয় যে যতক্ষন একটা জিনিষের উপর এক গবেষক গবেষনা করছেন অন্য সহকর্মী সেটাকে নিয়ে কাজ করেন না। এর পর মানস লিখছে যে লগ বুকের রেকর্ড থেকে অ্যালমারীতে থ্যালিয়াম সালফেটের এক ভায়েল কম দেখাচ্ছে। কেসটা সে বুঝতে পারছে আর সেই লাইনে চিন্তা করে অ্যাটোমিক অ্যাবযর্বসন স্পেকট্রোসকোপির রেজাল্টে .থ্যালিয়াম পাওয়া গেছে। এবার আমি মানসকে ফোনে কনগ্রাচুলেট করলাম ও আমার টেষ্টটাও যে থ্যালিয়াম তা ওকে বললাম। এর পর ওর সুবিধার জন্য থ্যালিয়ামের বিষ ক্রিয়া সমন্ধে পরের প্যারাগ্রাফটি জুড়ে দিলাম।

.থ্যালিয়াম প্রায় একই সাইজের জন্য পটাসিয়ামের জায়গা দখল করে পটাসিয়ামযুক্ত শরীরের প্রক্রিয়া গুলিকে থামিয়ে দিতে থাকে। ফলে ক্রেব সাইকেলের গ্লুকোজ মেটাবলিজমে এটিপি তৈরী প্রক্রিয়াকে কে বাধা দিতে থাকে। এদিকে পটাসিয়াম-সোডিয়াম চ্যানেল গুলি পটাসিয়ামের অভাবে ঠিক কাজ না করতে পারার জন্য সেল-ম্যাম্ব্রেন গুলি ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে সেল গুলির মৃত্যু হতে থাকে। এখানেই শেষ নয়, রিবোক্লাবিনের সঙ্গে যৌগিক প্রক্রিয়াতে থ্যালিয়াম ক্লাবিন যুক্ত কোএইনজাইমগুলির কাজ বন্ধ করে দেওয়ায় প্রয়োজনীয় ইলেকট্রনের যাতায়াত বন্ধ করে এবারে এটিপি তৈরী বন্ধ করে দেয়। এ ছাড়া সালফারের প্রতি থ্যালিয়ামের আসক্তির জন্য সালফার যুক্ত সিস্টাইন নামক অ্যামিনো অ্যাসিড দিয়ে তৈরী প্রোটিন গুলির কার্য ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। এই শেষ কাজটির জন্য সালফার যুক্ত প্রোটিনগুলির বিপদজনক ফ্রী-রাডিকেল গুলিকে নষ্টকরার ক্ষমতা কমে যেতে ব্রেনের সেলিব্রিয়ামে এর আঘাতের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে। এ ছাড়া সেন্ট্রাল নার্ভাস সীষ্টেমের মোটর সিগনালগুলি নষ্ট করে দেওয়ার জন্য শরীরের অঙ্গ প্রতঙ্গের মুভমেন্টের কোঅর্ডিনেসনের ব্যাঘাত ঘটে।

যদি প্রথমেই থ্যালিয়াম ধরা যেতো তাহলে রাঘবনকে আমি প্রুসিয়ন ব্লু মানে পটাসিয়াম ফেরোসায়ানাইডের সঙ্গে ফেরিক আয়রনের যৌগ ফ্রেশ তৈরী করে জলে সাসপেনসনে সেটাকে ঘোলের মত করে খাওয়াতাম। এটা পেটে গেলেই থ্যালিয়ামের বেশী আসক্তি প্রুসিয়ান ব্লু যৌগের প্রতি হওয়াতে যে পটাসিয়ামটি ঐ যৌগের মধ্যে থাকে তাকে সরিয়ে দিয়ে পটাসিয়ামটির জায়গা থ্যালিয়াম দখল করে নেয়। এর ফলে থ্যালিয়ামযুক্ত প্রুসিয়ান ব্লু অঘুলনশীল হওয়ার জন্য শরীরের কোনো কোষের সংস্পর্শে আসতে না পেরে ঘুমিয়ে পড়ে ও পরিশেষে মলের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। এদিকে যে পটাসিয়ামটি এই প্রকিয়ায় বেরিয়ে আসে সেটা শরীরের পটাসিয়ামের অভাবটি দূর করতে সাহায্য করে। তাই কোনো ল্যাবে থ্যালিয়াম নিয়ে কাজ হলে প্রুসিয়ান ব্লুর ঘোল বোতলে ভরে প্রয়োজনে লাগতে পারে ভেবে করে রাখা উচিৎ।

পরিশেষে লিখলাম যে মিসেস মুখার্জীকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবে যে কি প্রকারে সবাই-এর চোখে ধুলো দিয়ে ডঃ বিজয় পাটানকর রাঘবনের খাবারে স্বাদহীন বর্নহীন গন্ধহীন.থ্যালিয়াম সালফেট মিশিয়েছিল। ভদ্রমহিলা নিশ্চয় বিজয়ের মোটিভ এখোনো বুঝতে পারেননি।দই বা রায়তায় রাঘবনের আসক্তির সুযোগ ডঃ পাটানকর নিয়েছিল গ্রাম খানেক লেদাল ডোজের থ্যালিয়াম সালফেট মিশিয়ে দিয়ে যা পুলিসের জেরায় নিশ্চয় বেরিয়ে আসবে। এ ছাড়া অন্য কোনো ঘটনা না ঘটারই কথা।

রাত্রিতে বিছানায় শুয়ে রাঘবনের মৃত্যুর কারন যে ঈর্ষাজনিত তা ভাবছিলাম আর তখনই মানসের ফোনে জানতে পারলাম যে মিসেস মুখার্জী মনে করতে পেরেছেন যে রাঘবন দই চেয়েছিল আর তিনি খাওয়া ছেড়ে ওঠে তা দেবার আগেই বিজয় ডাইনিং চেয়ার ছেড়ে রান্না ঘরের ফ্রীজ থেকে দই আনতে গিয়েছিল। বিষটা সে ওই সময়ে মিশিয়ে থাকতে পারে। বিজয়ের ইনটারোগেশন চলছে। উত্তরে ফ্রাষ্ট্রেশন ও প্রফেশনাল জেলাসীই যে এই হত্যার মোটিভ তা মানসকে বললাম। একবার বিছানা ছেড়ে কম্প্যুউটারটা খুলতে হলো।রাঘবনের পুরো ফাইলটার নামকরন, 'ডিসকভারী ল্যাবের কেস হিষ্ট্রী : রাঘবন মৃত্যুরহস্য' এইভাবে সেভ্ করলাম।

পরেরদিন ব্রেকফাষ্ট টেবিলে খবরের কাগজে একটা নিউজ এর হেডিং চোখে পড়লো–,"জাতীয় গবেষনাগারে এক সহকর্মীর দ্বারা প্রতিভাবান বৈজ্ঞানিকের হত্যা"